অজিত দত্ত : জীবন এবং কাব্য ও অন্যান্য রচনা

সমীক্ষা ও মূল্যবিচার

(সংযোজন অংশ : বাংলা পি.এইচ.ডি. উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রদত্ত)

শান্তনু প্রামানিক

NORTH BENGAL
University Library
Raja Rammohunpur

114314
21 JAN 1997

STOCK TAKING - 2011

:: সূচীপত্র ::

১. রবীন্দ্রনাথ, সমকালীন অন্যান্য কবি ও অজিত দত্ত : পৃঃ- ১-২৩

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অজিত দত্তের স্থান : পৃঃ- ২৪-২৯

৩. উপসংহার : পৃঃ-৬০-৬৮

:: ভূমিকা ::

বর্তমান আলোচনাগুলি আমার গবেষণাকর্ম 'অজিত দত্ত : জীবন এবং কাব্য ও অন্যান্য রচনা সমীক্ষা ও ~~[illegible]~~ 'বন্যবিদার' -এর সংযোজন অংশ। এই পর্বে আমরা তিনটি নতুন অংশ (যথাক্রমে ১. রবীন্দ্রনাথ, সমকালীন অন্যান্য কবি ও অজিত দত্ত ২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অজিত দত্তের স্থান ৩. উপসংহার)রাখছি।

বর্তমান গবেষণাকর্মের অন্যতম পরীক্ষকের নির্দেশ অনুসরণে এই গুলি লেখা হয়েছে। মূল গবেষণা - কর্মের সঙ্গে এই অংশটি যুক্ত করে নিলে আলোচনার মান বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে গবেষণাটি শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

- শা-আন প্রামানিক

:: রবীন্দ্রনাথ, সমকালীন অন্যান্য কবি এবং অজিত দত্ত ::

মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তীকে স্মরণে রেখেও আমরা বলতে পারি বৈষ্ণব পদাবলীর পরবর্তী প্রায় সোয়া-দুশো বছরের কাব্য ও সাহিত্যের, বিশেষভাবে বাংলা কাব্যের আধুনিক দিক্ নির্দেশক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুসূদন বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগীয় প্রথা ও সংস্কারের বেড়া ভেঙে আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিয়েছেন। অন্যদিকে কবিতাকে বাইরের বা বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে ভিতরের বা আত্মোতান্ত্রিকতার দিকে ফিরিয়ে আনলেন বিহারীলাল। কি-তু ছন্দে, মিল বা উপমায়, চিত্রকল্পে, প্রকরণে, দর্শনে, ভাব ও লাবন্যে বাংলা কাব্য রবীন্দ্রনাথের হাতে তার নিজস্ব স্বভাবে স্থিত এবং সক্রিয় হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রযুগ বলে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে সময়কে চিহ্নিত হতে দেখি তাকে বাংলা সাহিত্যের পরম প্রাপ্তির যুগ বলতে কোন অসুবিধে নেই।

রবীন্দ্র চিন্তা চেতনার শেষকথা পার্থিব শোক ও দুঃখ, কষ্ট ও অমঙ্গল, এবং নাস্তিতে আস্থা ও সমর্পণ নয়। এর থেকে উত্তরণ আর মঙ্গল বোধ ও প্রশান্তি এবং আনন্দময়তায় সর্বস্ব নিবেদন। প্রশান্ত শুভ্রতার স্নিগ্ধ প্রভা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সহ সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চিন্তে বিকশিত ও কালজয়ী করেছে। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ দুঃখের, বেদনার কবি নন। আনন্দ ও উত্তুঙ্গ উৎসাহের কবি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া এই আশ্বাস ও তার আকর্ষণ তাঁর সমসাময়িক ও অল্প পরবর্তীকালের কবিদের পক্ষে ছিল পরম আশ্রয় ও নির্ভরযোগ্য উপাদান। তিরিশের কবিদের কাছে যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষত অনুসরণ হয়ে ছিলেন না। কেননা রবীন্দ্রনাথ আকৈশোর, তাঁর যৌবনের শতকের কালে যে প্রায় সুস্থির ও সময় ও সমাজ পেয়েছিলেন সেই উনিশ শতকের উদ্বেলহীন জীবন প্রণালী একালে কবিরা পাননি। সেই ভাবলোকের মঙ্গল ও শান্তির আশ্বাস যেমন ছিলনা, তেমনি যাবতীয় প্রথা, ন্যায়-নিয়মে আস্থা, নীতি-পরায়ণতা বা ঈশ্বরে দ্বিধাহীন ভক্তিও এসময়ে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়াও প্রকৃতি ও সুন্দরের কাছে যে নিঃশর্ত আত্মদান, পারিবারিক নিশ্চিত আশ্রয় ইত্যাদি সবকিছু প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। এতদিনের পালিত সামাজিক ও অন্যান্য এবং আত্মিক সকল সম্পর্ক মূল্যহীন ভিতর এলো অবিশ্বাস। অবিশ্বাসই টেনে নিয়ে এলো বিদ্রূপ দুঃখজর্জর অনাস্থা। এলো দুঃখবাদ, মানুষ টের পেল অমঙ্গল, অসত্য ও নাস্তিক্যবোধের যন্ত্রণা। যা কিছু প্রথাগত, প্রচলিত তাকে আবার নতুন জীবনবোধের, অবস্থার আলোতে, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখার প্রবণতা। সচেতনভাবে সবকিছুকে স্বীকার-অস্বীকার এবং মনোযোগী বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে জন্ম হলো নতুন প্রজন্মের। তাই খুব স্বাভাবিক এবং সংগত কারণে এই সময়ের সৃষ্টিশীল সচেতন কবি ও সাহিত্যিকেরা স্থির, নিশ্চিত অবস্থায় পুরোন' সুস্থিত কল্পনাবিলাসে

মগ্ন হতে পারেন নি। এই সময়ের ভিতর ফ্রয়েড এবং পাভলভের মনোবিশ্লেষণা পাঠের সুযোগে জানা হয়ে গিয়েছে মানুষের মনের জটিল বিন্যাস। যে মানব হৃদয় এতদিন জানা ছিলা একমুখী ও সমতল, সেখানে জানা গেলো তার দ্বিচারি বা বহুচারী গঠনকলা। তার গভীরতর রহস্যময় দিকগুলি। পরিচয় হলো মনের অতল থেকে উঠে আসা জটিলতম অনুভূতিমালার খবর। অন্য দিকে কার্লমার্কস ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস প্রবর্তিত আধুনিক শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার হাতছানি আমাদের পালিত অর্থনীতির অসাড়তাকে উপস্থিত করল আরও একবার আরো সরল বিন্যাসে। নতুন জ্ঞানের দীপ্তায় জগৎ ও জীবনকে যে এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার অভিজ্ঞতা, তারই ফসল তিরিশ ও পরবর্তী আধুনিক কবিতা, আধুনিক সাহিত্য।

একদিকে রবীন্দ্রনাথের অটল স্থৈর্য ও উত্তুঙ্গ কল্পনা ঐশ্বর্য, অন্যদিকে বাস্তবের জীবনের এই রূঢ় পরিস্থিতি। এই দুয়ের সংঘর্ষ এবং যুগ্মতায় কিছুটা দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে একে একে কাব্যসাহিত্যের জগতে প্রবেশ করলেন বিশেষরূপে চিহ্নিত তিরিশের যুবক কবি ও সাহিত্যিকেরা। তাই এই বিশেষ সময়টুকুতে লেখা কবিতায়, সাহিত্যে, এই দুয়েরই হাতছানি। একদিকে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে, তাঁকে অস্বীকার করে অন্যজগৎ তৈরীর প্রবল বাসনা। অন্যদিকে প্রাচীন যা কিছু তাকে সমূলে নয় বিচার বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ফিরে পাবার উদ্যত কামনা। দুটি নমুনা —

" বধূ শুয়ে ছিলো পাশে — শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো — জ্যোৎস্নায়, — তবু সে দেখিলো
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল — লাফকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার"

(আট বছর আগের একদিন। জীবনানন্দ)

অন্যপ্রকারে —

" সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি — মিথ্যা সনাতনী !
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা —
কটাক্ষ — ইঙ্গিত তার — হৃদয়ের বিলাসকরণী !
স্বপনের মণিহারে হেরি তার নিত্য নব রচনা !

(পান্থ। মোহিতলাল)

স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছার্থে অতুচ্ছ হরিপদ কেরানিকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়ে যে পরিচয় দিয়েছেন তা যথেষ্ট মনে হয় নি। এবং শেষপর্যন্ত অনন্ত সত্তের কাছে তার নিঃশর্ত সমর্পণ। বাঁশি কবিতাটির শেষ পংক্তি গুলি স্মরণ করতে পারি। —

'' হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র ফেলে চ'লে গেছে
এক অক্ষ বৈকুণ্ঠের দিকে।
এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত সেখানি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী ;
তীরে তমালের ঘন ছায়া ;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে তার
পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর। ''

(বাঁশি । রবীন্দ্রনাথ)

সুতরাং তিনটি স্পষ্ট ভিন্ন বক্তব্য ও চিন্তা বিন্যাস সূত্রানুসারে আলোচ্য কবি অজিত দত্ত প্রসঙ্গে বলা যায় যে তিনি যেমন উচ্চকণ্ঠ হয়ে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির কথা বলেন নি বা তাঁর কাব্যে নেই চেষ্টাকৃত সেই প্রয়াস চিহ্ন , তেমনই রবীন্দ্রনাথকে অতিসহজে আত্মসাৎ করে তরল পথটিতে তাকেই হুবহু অনুসরণ, অনুকরণ করে কবিতা সৃষ্টিও করেন নি। তাঁর ভিতর রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করবার প্রবণতা আছে। আছে বাস্তব পরিস্থিতি ও নতুন বিধিব্যবস্থাকে গ্রহণের মানসিকতা যা নেই তা দুঃসংস্কারের বিদ্রোহ। নেই ঐতিহ্যকে অস্বীকারের প্রয়াস। তিনি নিজেও এ বিষয়ে ছিলেন পূর্ণ সচেতন — '' সম্প্রতি বাংলা কবিতায় মনোধর্মিতা বা ইনটেলেক্ট -এর প্রাধান্য অতি প্রবলরূপে প্রকট হয়েছে। বিশেষ বিশেষ পাশ্চাত্য কবির প্রভাব সচেতন ভাবে আত্মসাৎ বা অনুসরণ করাও এ-যুগের

কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । এ-সব দিক থেকে আমার কবিতা আধুনিক যুগোপযোগী বর্তিভূত সন্দেহ নেই।''[১] নিজের কবিতার এই বিচার বিশ্লেষণ যথার্থ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন কালেই চলিত প্রথা অনুসরণ করেন নি। কোন তাৎক্ষণিক ও উদ্ভূত যুগোপযোগী আদর্শের অনুসরণ করেন নি নিজেকে। বরং ঐতিহ্য পালন সত্ত্বেও এই কবি বাস্তবের রূঢ়তার ভিতর থেকে কল্পনাকে অবলম্বন করে দিব্যলোক এক স্তরে পৌঁছবার প্রয়াস নিয়েছেন। একটি নমুনা —

'' বাহিরে চাহিয়া দ্যাখো। সেটি রাত্রি চমৎকার নয়?
হয়তো এমন রাত্রি এ-জীবনে আসিবে না আর।
জানুক সকল লোকে, এতটুকু করিনা কেয়ার,
কত ভালো লাগে আর ঔদাস্যের মিথ্যা অভিনয়।
নিঃঝুম নিশীথ এই জীবনের দুর্লভ সময়,
কুসুমিত অবকাশ সুজনার কাছে আসিবার ।।''

(দুর্লভ রাত্রি। প্রবিত দত্ত)

রবী-দ্রনাথের মঙ্গলের ধারনা, বিশ্বাস অজিত দত্তের কবিতায় সুপ্রচুর নয় বা বিস্তারিত নয়। ' পূরবী ' কাব্যের একটি কবিতায় রবী-দ্রনাথ লিখেছেন —

'' বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষ চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
হৃদয়ের নিকটতম দ্বার —
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার ।'' (পূর্ণতা । রবী-দ্রনাথ)

রবী-দ্রনাথের এই বিশ্বাসের জগত জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত ও অবিকৃতই ছিল। যদিও তাঁর সৃষ্টিজীবনে পরিবেশের নিয়ত পরিবর্তন তিনিও অন্যান্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেছেন। বিচার

বিশ্লেষণ করেছেন। তথাপি এই এগুলি কিছুই তাঁর চিত্তজগতে উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এমন কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেও তিনি ক্ষুব্ধ-দুঃখিত হয়েছেন। বিচলিত হয়েছেন। তার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তার পরিণামকে সীমায়িত করে দেখে ও পরবর্তী তাৎক্ষনিক ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে আত্মস্থাৎ করার মানসিকতা তিনি দেখাননি। তবশ্য

'' রবীন্দ্র প্রতিভার মৌল কথা ছিল অন্তিক্রতার সম্প্রসারণ। তিনি কোথাও থেমে থাকতে জানতেন না। ''২

কিন্তু সেই সম্প্রসারণ বা থেমে না থাকার অর্থ আমাদের কাছে এই যে তার প্রতিভাকে তিনি যেমন চিনতেন তেমনি তাঁর চিত্তপ্রবাহের গতিবিধি ও সহ্যকরার ক্ষমতা এবং সবকিছুকে গ্রহণের পর তার প্রকাশ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। অজিত দত্তের কবি প্রকৃতির ধরণ অন্য-প্রকার। উগ্র আধুনিকতার ধোলস তিনি স্বেচ্ছায় দূরে রেখেছিলেন - একথা সত্যবলেই যে তিনি রবীন্দ্রকাব্য বলয়ে প্রোথিত তা নয়। রবীন্দ্রনাথকে ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকারে তাঁর কোন সংকোচ ছিল না এটা সত্য। কিন্তু সেই সত্য রবীন্দ্রবিলাস বা নিমজ্জনে নয়। তিনি রোমান্টিক, তবু ভাষার সহজ চলন, ঘরোয়া রূপ রচনার ভঙ্গি রবীন্দ্র-রোমান্টিকতা থেকে এ লেখাকে স্বতন্ত্র করেছে। উদাহরণ —

'' দ্যাখো, দ্যাখো! মেঘ-ভারে দিবালোক হয়েছে মেদুর,
তরল তন্দ্রার মতো গূঢ় ঘোর ছেয়েছে আঁধারে।
কখন্ আসিবে তুমি? রজনী, সে আরো কতদূর!
এ ঘোর ভোরের স্বপ্ন - একি কভু মিথ্যা হ'তে পারে ?
ফুলের পর্শের মতো নয়নে যা লেগেছে মধুর,
তুমি ছাড়া হেন স্বপ্ন বলো আর কহিব কাহারে ? ''

(স্বপ্ন। অজিত দত্ত)

কবি অজিত দত্ত যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে কাল ছিল অস্থির। কবির জীবন প্রবাহও ছিল অনিশ্চিয়তা এবং অশান্তিতে পূর্ণ। শিক্ষা ও পরিপার্শ্ব অন্যরুচিতে গুথিতা তাই মিশ্র এই বাচন পদ্ধতিতে ঔজ্জ্বল্য থাকলেও যেমন বিদ্রোহ নেই, সেরকম বৈষ্ণব কবিতার নিগর্ত সমর্পণ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ই উপস্থিত তবে আত্মবিলীনকরনে সক্ষম এর প্রকাশ ভঙ্গি আমাদের চিনিয়ে দেয় এর নিজস্বতাকে। বস্তুত অজিত দত্ত ই কবিতায় যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা ঐতিহ্য পাননের আকাঙ্ক্ষায়। এবং নিজের অধীনতায় যা গড়ে উঠেছে তা স্বাধীন ও স্বায়ত্ত শাসনের বলে।

রবীন্দ্রনাথের একটি অংশ পরিচয় তিনি প্রেমের কবি। এই প্রেম আনন্দ ও সৌন্দর্য সম্পৃক্ত। উল্লাস বা কামজ সংঘাত নয়। '' দেশের কাব্য সংসারে প্রেম ও কাম অবিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল। কিন্তু কামের বাহুপাশ হইতে কবি প্রেমকে উদ্ধার করিয়া বাঁচাইয়াছেন। '' পুরুষোত্তম আদি থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে প্রেমের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। তা ভোগের বা কামের উপকরণ শূন্য নয়। সে উপকরণ দিয়ে ভোগ সাজানোর আয়োজন আছে, 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র কিছু কবিতায়। কামকে রতিকলাকে যে উপায়ে তিনি ব্যবহার ও প্রবাহিত করেছেন তাতে যুক্ত হয়েছে ঐশ্বরিক মহিমা। তাই স্থূল কামজ বলে তা চিহ্নিত করা অসম্ভব। তাঁর কাছে কোন অবস্থাতেই নারী ইন্দ্রিয়সর্বস্ব নয়, অতীত এক শুভ্র অনুভূতি। অনেকটাই বৈষ্ণবীয় পদাবলী প্রেমের মত —

'' যত গোপনে ভালোবাসি পরাণ ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে। ''

(গুপ্ত প্রেম। রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্র প্রেম মানবসহচর, নারীর রয়েছে দ্বিবিধ সত্তা - কল্পনায় ও দেহগত রূপে যুগবিগ্রহে অজিত দত্তের কাব্যেও ভোগের আয়োজন নেই। উপস্থিত নারীটি রক্ত মাংসের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে না। উপলব্ধি বা পূজার আলোতে দেখা, জানা ও বোঝার প্রয়োজন নেই। কবিও নির্জনে তাকে পবিত্র প্রেমটুকুই দানে আগ্রহী। অন্যের উপস্থিতি সেখানে কাঙ্ক্ষিত নয়।

'' বলিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে-কানে,
কোন্ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ।
লঘু পদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে,
নিশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রাতুর রাতের বাতাস। ''

(কুসুমের মাস। অজিত দত্ত)

অথবা অন্যত্র —

'' মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চঞ্চল উদ্দাম,
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বপ্নের বাঁধিনাম। ''

(একটি কবিতার টুকরো। অজিত দত্ত)

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের নানা প্রসঙ্গও উৎস। প্রেমের আধারও নানাবিধ। অজিত দত্তর কবিতায় এই বিপুল ঐশ্বর্য নেই। থাকা সম্ভবও নয়। যদিও একথা সত্য প্রেমকে তিনিও চিরকালীন করার জন্য সমাজ সংসার থেকে দূরে সরে থাকায় দ্বিধাজড়িত মন। নয় শান্ত এই প্রেম কেবল নারীকে উদ্দেশ্য করে প্রবহমান। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র ঘরানার রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, এই পরিচয়টিও অখণ্ড নয়। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের যেন। তাঁর প্রকৃতি একদিকে মানুষের ভিতর প্রবেশ করে মানবীয় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত; অপরদিকে প্রকৃতির অন্তর্গত মানুষ শেষপর্যন্ত প্রাকৃতিক মানব মূর্তির প্রকাশ করেছে। এই দ্বিবিধ রূপ ও রূপান্তর তাঁর প্রকৃতিভাবনাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। একথা কবির নিজের ভাবনাতেই আছে।* তার প্রকৃতি কোথাও শান্ত ও কোমল মূর্তি। কোথাও তা আনন্দ প্রবাহ। আবার করাল ও সর্বগ্রাসী প্রকৃতি চিত্রও তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে এই প্রকৃতি নিঃসন্দেহে পটভূমিকা হিসেবে নয়। মানব জীবনের অঙ্গস্বরূপ তাঁর প্রকৃতি নিঃসন্দেহে তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মী যা জগৎ লক্ষ্মীও বটে। একথা সত্য প্রকৃতিতে লীন হয়ে থাকা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট কবি তাকেই আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল—

'' হেরো আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহো দেখা
এই বিশ্বসৃষ্টি — মাঝে, অসীম সুন্দর,
ত্রিলোকানন্দন মূর্তি। আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষ্ণায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
* * *
একাকিনী বসে আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বমোহাসিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা। ''

(জ্যোৎস্নারাত্রে । রবীন্দ্রনাথ)

একুশ বছর বয়সে লেখা 'কুসুমের মাস' গ্রন্থের 'প্যারাডাইজ লস্ট' কবিতায় অজিত দত্ত পৃথিবীর রূপকে-প্রকৃতিকে দেখেছেন' অবাক বিস্ময়ে।' প্রেমের মায়াঞ্জন তখন তাঁকে বিবশ করে রেখেছে -

'' একদিন স্বর্গ হতে নামিলাম পাখা ভর করি'
মর্ত্যলোকে - কী বিচিত্র পৃথিবীর বিস্তীর্ণ মিছিল!
অবাক বিস্ময়ে আমি দেখিলাম আকাশের চিল,
দেব - নেত্র বিস্ফারিয়া দেখিলাম সিন্ধুর লহরী।
দেখিলাম পৃথিবীর লাল ফুল, কালো বিভাবরী,
সবুজ গাছের পাতা, আকাশের সুগভীর নীল। ''

অজিত দত্তের এই 'প্রকৃতি' চেতনা কোন পূর্বার পুণ্যয় নির্দেশ করছে না। কতকটা গ্রীক পুরাণের সেই ওড়ার ক্ষমতাবান মানুষের দৃষ্টিতে কল্পনা বিস্তারিত হয়েছে। যথাযথ এবং স্বাভাবিক প্রকৃতির রং রূপ, রস আস্বাদনে তিনি যে তৃপ্তি পান, সে কথাই বর্ণিতা অতিরিক্তের আগ্রহহীন প্রায় নিরপেক্ষ এই দৃষ্টিতে অবশ্য উদাসীনতার কোন প্রকাশ নেই। অথবা তা হয়ে ওঠেনি কেবলমাত্র কবিতা বিষয়ক পটভূমি। আবার রবীন্দ্র প্রকৃতির মত তা কবির কাব্য লক্ষ্মীস্বরূপাও নয়। রবীন্দ্রনাথে প্রত্যয় যে পরিচর্যা ইন্দ্রিয়গত ও শেষ পরিচর্যায় যে বিশ্বগত ইন্দ্রিয় অতীত অনুভূতি, এর কাব্যে এ সবের কোনটিই নেই। প্রকৃতপক্ষে শুধু প্রকৃতির উপাসনাও অজিত দত্ত কোন কবিতায় করেন নি। সর্বত্রই জীবনের একটি ভূমিকা সেখানে এসেছে। তবে তা তার একান্ত নিজস্ব জীবন পথটির অনুসরণে। প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন - রচনা করেছেন-তার উত্তাপটুকুও গ্রহণ করেছেন-তবে তা কোন অবস্থায়ই অন্যসকলের অনুকরণে নয়।

সমকালের অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে এরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে মান্য করেছেন। সময় বিশেষে কমবেশি তাঁর প্রভাব স্বীকার করেছেন। এবং সকলেই রবীন্দ্র যুগের কবি। তবে নিজস্বতায়, বৈশিষ্ট্যে এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮ - ১৯২০) কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২ -১৯৭০) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২ - ১৯২২) মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮ - ১৯৫২) জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯ -১৯৫৪) এবং বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৯৪) এই খণ্ডে আমাদের আলোচ্য কবি।

কবিদেবেন্দ্র নাথ সেন এক কথায় Romantic গার্হস্থ্য জীবনের কবি। এই গার্হস্থ্য জীবন তৃষ্ণাই দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার চালিকা শক্তি। নমুনা -

'' এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মূরতি মোর হৃদয়েতে রাজে।
পাটল অধরে তার,

চন্‌চল ধূসর কেশে
ডুবায়ে তুলিকা মন, আঁকি আমি ছবি—"

(আমি কে । দেবেন্দ্রনাথ সেন)

অথবা "ঝাঁপটি দিয়েছে ধূলে, এই দোষ ওর
ঝোকারে বোলো না কিছু এ মিনতি মোর ।"

কবির এই বাঙালি পৃথক্‌পুঞ্জী প্রেমানুভূতি অথবা সেই নিহিত নির্ভরতাই তাঁর কাব্যে সৌন্দর্যের উদ্দেশিকা মোহিতলাল মজুমদার চমৎকার বলেছেন - "কাব্যক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যই প্রথম হইতে তাহার হৃদয়ে আধিপত্য করিয়াছে, সৌন্দর্য্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বিস্তার হইয়াছে, সৌন্দর্য দৃষ্টি আরও ব্যাপক হইয়াছে, ...।"[৪] অজিত দত্ত অবশ্য গার্হস্থ্য জীবন প্রণালীর স্মরণে[লীলায়িত] নন। আবার কোথাও বিষয়ের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিতও তিনি করেন নি। তাঁর কবিতায় বাঙালির যে গার্হস্থ্য জীবন চিত্রের পরিচয় আছে, তার অনেকটাই স্মৃতিবিধুর তাই আবার বিশুদ্ধ ও কিছুটা মন্থর জীবন যাপনাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গেও যুক্ত। দুটি নমুনা -

"তবু এই সাধারণ নীড় — সে তো মানে না শাসন,
পুরোনো স্নেহের মোহে চিরদিন রয় সাধারণ,
ছোট ছোট সুখ আর দুঃখের আশনা একে
অনুশাসনের যত ক্ষত রাখে ভুল দিয়ে ঢেকে ।"

(সাধারন । অজিত দত্ত)

অথবা' খান্ডব দাহন' কবিতায় পাই—

"কয়েক প্রহর আগে, এখানেও ছায়াচ্ছন্ন নীড়ে
সহজ বাৎসল্য - প্রেম, আশা স্বপ্ন শৈশব - যৌবন,
সবি ছিল প্রানোচ্ছল, ছিল ধূত জীবনের ঘিরে
আনন্দের আকাঙ্খার স্পন্দিত ছন্দিত আবরণ।"

অজিত দত্তের গার্হস্থ্যজীবন চর্যার যে প্রকার পরিণতি তার কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে তার মূল প্রেরণা শাশ্বত জীবনবোধে আস্থা আর তা প্রায় বিনম্র প্রেমানুভূতির মতই স্নিগ্ধ।

যথাযথ গার্হস্থ্য জীবন নয়, গ্রাম জীবনের ধ্বনি বুকে নিয়ে সরল-আভরণহীন খুন ছায়ার মত কণ্ঠস্বরে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতায় যখন পাই —

'' গুটি ছয় পায়রা ও গুটি কত শালিখে
আমাদের ঘরে করে একসাথে বাসরে।
আসে কাক একঝাঁক
করে খুব হাঁকডাক
কোকিলের কণ্ঠসাট শুনবিতো যাস্‌রে। ''

(আমাদের সখ। কুমুদরঞ্জন)

আর এই কবিতারই শেষে যখন তিনি বলেন' এক সাথে কোথা পাব এত সাধ সখ ' তখন কবির পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়, তা হলো সমগ্র বিশ্বকে তিনি কাছের ধন করেন নি। একখণ্ড গ্রামই তাঁর ঈপ্সিত। অজিত দত্তের সঙ্গে এখানেই তার অন্তরঙ্গ মানসিক যোগ। তিনিও বৃহৎবিশ্ব সম্পর্কে সদা কৌতূহলী নন, বা তুমুল সংরাগ প্রায় কোন কবিতাতেই নেই। তিনিও কুমুদরঞ্জনের মত বলেছেন -

'' সমস্ত পৃথিবী নয়, সমস্ত আকাশ নয়,
নয় আদিগন্ত মাঠ, সিন্ধু গিরি মালা,
হীনপ্রভ চোখে শুধু একখণ্ড বিশ্বরূপ -
কাঠের সীমানা আঁটা একটি জানালা। ''

(জানালা। অজিত দত্ত)

একথাও মনে রাখতে হবে তখন একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দিগ্বাহারিক কল্পনা দীপ্তি, অন্য দিকে আধুনিক কবিদের বহুচারী নতুন তত্ত্ব এবং এই উভয় প্রভাবই প্রায় যত্নে ও রচনা প্রকরণগত ব্যাপারে পাশ কাটিয়ে কুমুদরঞ্জন পল্লীজীবনের শান্ত আশ্রয়ে তাঁর প্রীতি ও ভক্তি উন্মোচন করেছেন। অজিত দত্ত নাগরিক কোলাহলে স্থিত হয়েও স্বপ্ন ও রূপকথার জগতে নিজের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। রূপসী বাংলার আর এক কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই দ্বিমুখী, আপত সীমিত ও আচ্ছন্ন প্রীতির অনুভব লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

'' বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর :''

(রূপসীবাংলা। জীবনানন্দ)

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ক্ষেত্রে যা তার গোটা জীবনের প্রক্রিয়া ও বিশেষভাবে পল্লী আশ্রিত রূপায়ণ নির্মান। জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে তাই'' খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে'' [৫] রচিত।

অজিত দত্তের কাব্য রচনার শুরুর পর্বে যদিও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকে, তবু তখনও তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতায় সম্পূর্ণত অপসৃত হয় নি। যদিও অজিত দত্তের কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই, তবু কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয়ের কবি স্বভাবের পার্থক্য দুটি নমুনা দ্বারা আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি। সত্যেন্দ্রনাথ প্রেমের প্রসঙ্গে —

"মধুর মত মদের মত, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলায় ভালো,
অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো!
নিশ্বাসখানি পড়লে জো'রে হ'তাম গো নিশ্চুপ। -''

(তোড়। সত্যেন্দ্রনাথ)

অজিত দত্ত সেই প্রসঙ্গে -

'' তোমারেই ভালোবাসি। সত্য আজ লোনায় চাতুরি
বহু প্রণয়ের জালে আবদ্ধ অতীত-প্রীত মনে।
সঙ্গমাত্র আহরণ, তারপর তোমারে ঘেরাই।
স্মরণের অবরোধ ছিন্ন করে যতটুকু পাই
তোমার সান্নিধ্যে আসি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত চয়নে
দুর্লভ তোমার সাথে হৃদয়ের খেলি লুকোচুরি।।''

(চুরি। অজিত দত্ত)

দুটিই প্রেম বিষয়ক কবিতা। কিন্তু প্রথমটিতে প্রেমের বহিরঙ্গ উচ্ছাস। দ্বিতীয়টি তারই অন্তরঙ্গ সঞ্চার। প্রথম কবিতাটি আমাদের আকর্ষণ করে, দ্বিতীয়টি আপ্লুত করে। কবি সমালোচকের কথায় পাই -'' কবির কর্তব্য তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের আর অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবন।'' [৬] সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে শুধু মালাই রচনা করেছেন, অজিত দত্ত সেখানে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ভাবব্যঞ্জনাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতিহাস কথা ও পুরাণের প্রসঙ্গ এঁদের দুজনের কবিতায় অনেকবার ঘুরে ফিরে এসেছে। দুটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি -

'' সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলায়,
সে প্রেমের রূপ অপরূপ,
সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়
জ্বলে তায় চির-পূজা-ধূপ,
সম্রাট ! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
মরলোকে অমৃত স্বরূপ।''

(তাজ । সত্যেন্দ্রনাথ)

এবং

'' অকস্মাৎ জাদুমন্ত্রে সে-যিছিল স্তব্ধ করি দিয়া
গৌরবে রানির মতো, মহীয়সী, তুমি এলে ধীরে
মুগ্ধনেত্রে চাহিলায়। তোমার দু চোখের তিমিরে
লোষ্ট্র-সম সব স্বর্ণ ডুবে গেল মুহূর্তে কালিয়া,''

(প্যারাডাইজ লস্ট। অজিত দত্ত)

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ইতিহাসের প্রসঙ্গ সরাসরি স্বনামে ও পুঞ্জীভূতভাবে উপস্থিত। অজিত দত্ত তাকেই ব্যবহার করেছেন ঘুরপথে - নামগোত্র পরিচয় মুক্ত রূপে।

মর্ত্যজীবনে প্রকৃতি ও পুরুষ যুগ্মভাবে জীবনকে বিকশিত ও অর্থবহ করে তোলে। তাই প্রকৃতিরূপী নারীকে তার শরীরী সত্তায় স্বীকারই যথার্থ। পাশাপাশি নমনীয় পার্থিব বিকাশে দেহ অনিবার্য সত্য। নতুবা গোটা ব্যাপারটাই কল্পনার বিষয় হয়। সমালোচনায় বলা হয়েছে, যোহিতলাল বাংলাকাব্যে ভোগধর্মী দেহবাদের প্রবক্তা। আমাদের বিবেচনায় তিনি তাঁর কাব্যে সুস্থ ও স্বভাব অনুগত শরীরকে স্বীকার করেছেন, সেখানে ভোগের কোন উত্তাল দাপাদাপি নেই। তাই কামনা বাসনায় জারিত দেহও কখনো বা শান্ত ও অলৌকিক হতে চায় কোন বিশুদ্ধ সত্তায় —

'' মর্ত্য-পারিজাত ওই দু'অধর শোনিত-বরণ,
পিপাসার মত-সঞ্জীবনী —
নিবিড় চুম্বন যার — মুমূর্ষুর মৃতিকাভরণ,
নেচে ওঠে সকল ধমনী —
তা'ও আজ ম্লান, সখি, নাহি তায় জ্বালা উন্মাদন,
এ হৃদয়-মধুপ-বাটিকা''

(অকাল-সন্ধ্যা । যোহিতলাল)

অজিত দত্তের অনুরূপ অভিজ্ঞতা আছে। তাই তিনি জানেন –

'' দন্ডেই নেশা পলেই ফতুর এমনি তোমার জাদু ।
আমার রক্তে যে - স্বাদ, তোমার প্রেম কই তত স্বাদু?
দিগন্ত - ছোঁয়া কান্তার – মাঝে বিলাস – নীলার হর্ম্য,
সম্মুখে ঝিনুন উদ্যত, বুকে পুণ্যলিপির বর্ম ।

(চৌকাঠ । অজিত দত্ত)

'বন্দীর বন্দনা' এবং 'কুসুমের মাস' দুটো গ্রন্থই শেষপর্যন্ত ব্যক্তি নির্ভর ও আত্মকরুণা পীড়িত। তবে ব্যক্তিত্বের মাত্রাভেদে ও বিষয় বস্তুর বৈপরীত্যে অজিত দত্ত যেখানে বিবর্তনধর্মী ও প্রবহমান, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সেখানে – ''গতির দিকদিয়ে প্রায় সব কবিতার গড়ন আবর্তনধর্মী, রেখাকার নয়। এক আবেগ থেকে অন্য আবেগে বয়ে যাওয়ার এবং স্তরের আবেগকে আরও দূরে প্রসারিত করে দেবার ধারবৎ গতি এ কাব্যে নেই।''[৭] বুদ্ধদেব বসু লেখেন –

'' বিধাতা, জানো না, তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না - হয় ডুবিয়া আছি কৃষিঘন পংকের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু ।''

(বন্দীর বন্দনা । বুদ্ধদেব বসু)

অজিত দত্তের কবিতায় ব্যক্তিত্ব বা Personality র ঘনীভূত উত্তাপ সহজেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। আবার বুদ্ধদেব বসুর মতো তিনিও ব্যক্তিগত অনুভূতি নির্ভর। তাই তাঁর কাব্যেও প্রবল ব্যক্তি-সত্তার প্রবাহ লক্ষনীয়। সেদিক থেকে এঁরা উভয়ই এক গোত্রের । তবে বাচনিক ভঙ্গিতে বুদ্ধদেব বসু যেখানে উচ্চকণ্ঠ ও মুখর অজিত দত্ত সেখানে অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠ, আত্মমগ্ন এবং দ্বিধাজড়িত। প্রেমের আকাঙ্খা ও তার বিন্যাসে এরা পৃথক। অজিত দত্ত লেখেন –

'' আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।
মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম বিতানে।
বসিয়া নিভৃতে কুঞ্জে কহিব তোমার কানে-কানে,
কোন্ ভুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ। ''

(কুসুমের মাস। অজিত দত্ত)

'' কবিতার ভাষাই কবির প্রতিভার অব্যর্থ চিহ্ন। সমগ্র কবিতার পরিপূর্ণ গূঢ় শুভ্রতার বিচ্ছুরিত বর্ণালী হল কবিতার ভাষার ভিন্ন ভিন্ন স্তর।'' [৮] এদিক থেকে জীবনানন্দ দাশ ও অজিত দত্তের মধ্যে ভাষা শৈলীর স্বাতন্ত্র্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন –

'' শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস পেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের অঘ্রে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার – চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ''

(অবসরের গান। জীবনানন্দ দাশ)

আর অজিত দত্ত লেখেন –

'' দ্যাখো, দ্যাখো! মেঘ – ভারে দিবালোক হয়েছে মেদুর,
তরল তন্দ্রার মতো গূঢ় ঘোর ছেয়েছে আঁধারে।''

(স্বপ্ন। অজিত দত্ত)

উপরে উদ্ধৃত দুটি পংক্তিগুচ্ছেই দুই কবির নিজস্ব শব্দ নির্মাণ পদ্ধতি ও প্রয়োগ বিধি তাঁদের আলাদা করে যেমন চিনিয়ে দেয় তেমনি প্রতিটি শব্দের নিহিত ব্যঞ্জনা উভয় ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক অর্থ (Meaning) অতিক্রম করে কবিতার ভাব প্রবাহকে বিস্তার দিয়েছে। তবেও যে আয়োজনে '' রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে কবি ভাষার নতুন রূপ ও বর্ণ সৃষ্টি করে জীবনানন্দ দাশ আমাদের অনুভূতির জগতকে নব-নব আস্বাদনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন'' [৯] সেই প্রকারের বিস্তারিত ও যুগসৃষ্টি সম্ভব কবিভাষা অজিত দত্তের কবিতায় নেই। সেদিক থেকে তিনি বরং কিছু রবীন্দ্র অনুসরণাকাঙ্খী।

জীবনানন্দের কবি জীবনে স্পষ্ট দুটি ক্রম। একটি বরিশালের প্রবাহিত প্রকৃতি যুধর যুগ। দ্বিতীয় ক্রমে কলকাতা নগর জীবনে স্থিত যন্ত্রযুগের কালশীমা। এবং উভয় পর্যায়ের কাব্য ভাবনা, বিষয় বস্তু, বিন্যাস ও প্রয়োগবিধি বহুক্ষেত্রে অন্যপ্রকারের। অন্যদিকে অজিত দত্তের কাব্যের স্পষ্টত কোন স্থানিক পার্থক্য নেই। যদিও তাঁরও প্রথম যৌবন কেটেছে ঢাকায়। পরবর্তী সময়ে তিনিও ছিন্নমূল ভাবে স্থিত হয়েছিলেন কলকাতায়। কিন্তু তার 'নষ্টচাঁদ' ও পরবর্তীকালের সামান্য কিছু কবিতায় মাত্র ভিন্ন সুর, অন্য প্রকারের বিবেচনা আছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কালে জীবনানন্দ লেখেন –

'' আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন ধড়ের মাঠে পউস সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার, কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব।''

(মৃত্যুর আগে। জীবনানন্দ)

আর কবির 'সাতটি তারার তিমির' কবিতাগুচ্ছে পাওয়া গেল -

'' পৃথিবীতে চেরদিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান। ''

(বিভিন্ন কোরাস ১। জীবনানন্দ)

তবে কাব্যিক বিবর্তনের রেখা অজিত দত্তের কাব্যকে স্পষ্টত তাঁর উত্তরণ অথবা পরিণতি চিনতে আমাদের সাহায্য করেছে। স্বভাব সংযমী কবি অজিত দত্ত তিরিশ দশকের বিস্ময়। বিস্ময় কেননা এ সময়ের বিস্তৃত ও বহুমুখী জটিল জীবন চক্রের সাময়িকতায় তিনি মুগ্ধ ও আকর্ষিত মন। নিজেকে চলিত ফ্যাশনের অন্তর্ভুক্ত করার কোন মানসিকতাও তাঁর ছিল না। জীবনানন্দ যেমন প্রথম কবিতা রচনাকালে তথাকথিত 'সর্বপ্লাবী ভঙ্গুর অবিশ্বাসে আত্মমগ্ন হবার কথা'* ভাবেন নি। অথচ সেই সময়ে বসে অপরাপর প্রায় সব কবি কমবেশি এ ই ব্যাপারটি গ্রহণ করে সচেতনভাবে 'আধুনিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বা বিষ্ণু দে প্রমুখদের কাব্য প্রকরণ ও পদ্ধতি এবং বিষয় নির্বাচনে ও বিন্যাসে উপরে কথিত শর্ত প্রকটভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন ভাবে যৌবনের মুধাসিক্ত বাসনা কামনাময়তার অর্তি বুদ্ধদেবের কবিতাকে বোদ - লেয়ার বা র‍্যাঁবোর কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। বস্তুত তাঁর কবিতায় romantic idealism অনুপস্থিত। রোমান্টিকতা বলতে তিনি বুঝেছেন - '' রোমান্টিক বলতে আমি বুঝি শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোমান্টিকতা। যা ব্যক্তি মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার ক'রে নেয় - শুধু ইস্কি করা এটিকেট মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অখিলন ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে, তার মধ্যে যা কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবোধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা কিছু লোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় - সেই বিশাল ও স্বতো-বিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।'' [১০] প্রেমের শারীরিক বাসনা-কামনা ও জীবনের দুঃখময় পরিস্থিতিকে স্বীকার করার প্রবণতা তাঁকে করেছে অস্থির, তাঁর কাব্যকে করেছে আধুনিক। কিন্তু '' বাঙালী কবির পক্ষে সবচাইতে বড়ো কথা রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় স্ববলম্বনের বিবর্তন। এ সূত্রেই ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ আসে। জীবনানন্দ সমসাময়িক আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ঐতিহ্যবাহী। '' [১১] কেননা জীবনানন্দ ও অজিত দত্ত দুজনেই একই সঙ্গে কবিতার সততা, বিশুদ্ধতা, অনুভূতির প্রাধান্য স্বীকার ও ঐতিহ্যে বিশ্বাস রেখেই অগ্রসর হয়েছেন। জীবনানন্দ বিশ্বাস করেন - " যে কোনো সময়ের যে কোন জগতের সঙ্গে অন্তিক্যতা

114314
21 JAN 1997
BOSTAN BENGAS
University Library
Raja Rammohunpur

কোনো এক বিশেষ আধারে তাতে প্রবেশ লাভ করে যখন স্টিএশুলিতে ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শি তায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আধার অক্ষিয় কবিমন -- কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে।'' [১২] তাই এযুগে বসে জীবনানন্দ দাশ যখন লেখেন --

'' সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে।
কে থামিতে পারে এই আলোর আঁধারে।
সহজ লোকের মতো তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর, কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর , - শরীর স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর ! * * *
* * * *
স্বপ্ন নয়, - শান্তি নয় - কোন এক বোধ কাজ করে
আমার ভিতরে।'' (বোধ । জীবনানন্দ দাশ)

অথবা অজিত দত্ত যখন নেশাতাড়িত মানুষের মত বলেন --

'' যদের নেশার মত তাহাদের বাসিয়াছি ভালো,
সমস্ত ব্রহ্মান্ডে শুনি উহাদের পায়ের নূপুর,
জানি ওরা নিশাচরী, তবু মোর নিশীথের আলো।
জানি ওরা মৃত্যু আনে, তবুও সে - মরণ মধুর ।''

(পরী । অজিত দত্ত)

তখনই টের পাওয়া যায় এঁদের দুজনের কবিতু শক্তির বিশুদ্ধতা। সমর্থন মিলে যায় ঐতিহ্যকে স্বীকার ও তাকে আত্মগত করে নেবার পুবণতা। তাই ঐতিহ্যকে আত্মগত করে নিজেদের সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণত সংস্কার মুক্ত ও বিশিষ্ট কবি চেতনাকে যে উপায়ে পুবাহিত রাখতে পেরেছিলেন তাতে এঁদের বিশুদ্ধ আধুনিক কবি বলা যায়। আর এই আধুনিকতা শুধুমাত্র রূপগত বা বহিরঙ্গের কোন পুসাধন নয়। তা এরই সঙ্গে মনন ও হৃদয়জাত এবং শুদ্ধত চেতনা সমৃদ্ধ। উদ্দেশ্য উদ্যমের আয়োজন ও পরিকল্পনায় পার্থক্য রয়েছে।

পুকৃতপক্ষে পৃথিবীর সাহিত্য পুবাহের শ্রেষ্ঠ অংশটি চিরকালেই একই উপায়ে ব্যক্তিচেতনা আশ্রয়ী। এবং সেখানে বিশেষভাবে কবির অনুভূতি ও উপলব্ধি এবং এরই সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ। আর তার সঙ্গে

অনেক সময়ই যুক্ত হয়েছে হৃদয় বা ভাবময় কবিব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে - সুস্থির নয় এমন সময়ে এ সবের মূল্য, উপস্থিতি, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অসম্ভব এই বিশ্বাসে কাব্যসাহিত্য রচনা পথাতি খুলো কখনো বা শ্রেণীগত* এই শ্রেণীগত কাব্যরচনার প্রয়াস জীবনানন্দ দাশ অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখদের নেই।

অজিত দত্ত স্বভাষী রূপকথার ছায়াচ্ছন্ন একটি জগত গড়তে চেয়েছিলেন। এবং পুচ্ছনুরূপে রূপকথা কথিত সেই মায়াচ্ছন্ন জগত আশ্রয় করে আছে পুষ্টিকর বাস্তবতাকে। সুতরাং শুধু রূপকথা বললে যে অসম্ভব এক কল্পনা বিলাস বোঝায় তা কিন্তু অজিত দত্তের প্রার্থিত সত্য নয়। আমরা একে বলতে পারি রূপকী রূপকথা। যেমন —

'' কুমার শুনেছে রূপকথা,
সাপের নিঃশ্বাসে হিম পাতালের অবশ প্রাসাদে
কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে,
নীল সোনালতা।
সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফিরাবে কোন জন?

(পাতালকন্যা। অজিত দত্ত)

রূপসী বাংলা লেখার কালে এবং পরবর্তী কালে জীবনানন্দের কোন কোন কবিতায় সরাসরি এই রূপকথা জগতেই আত্মসমর্পণ আছে। একটি উদাহরণ -

'' মনে প'ড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম, - শোনো তবে, -
শুনিতে লাগিল সবে, -
শুধিনু কুমার;
কহিলাম, - দেখেছি সে চোখ বুজে আছে,
ঘুমোনো সে এক মেয়ে, - নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে,
সেইখানে আর নাই কেহ, —

* * *

এর যেন কোনদিন ছিলো না হৃদয় -
কিম্বা ছিলো - আমার জন্য তা নয়।''

(পরস্পর। জীবনানন্দ দাশ)

বাংলার রূপকথাকে প্রকৃত শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন দুজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বস্তুত উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে বাংলার প্রাচীন ও প্রায় লুপ্ত, ক্ষয়িত এই প্রত্ন-নিদর্শন উদ্ধার আকাঙ্খা তখন অনেককেই পেয়ে বসেছিল। নতুন দৃষ্টির আলোকস্নানে শুদ্ধ বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে - শিল্পে নতুন প্রাণায় পুর্নজন্ম হলো রূপকথার। রবীন্দ্রনাথ রূপকথার গল্পগুলিকে কবিতার স্তবক বিন্যাসে আর এক প্রস্থ সাজালেন -

'' তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায় । খুলি দিল কেশভার
আজানু চুম্বিত গোলাপি অঞ্চল খানি,
লজ্জার আভাস - সম , বক্ষে দিল টানি। ''

(বিস্মৃতি । রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথ যে উপায়ে বাংলার এই প্রাচীন রূপকথা গুলিকে classical বা চিরায়ত স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন সেই পথেই পরবর্তীকালের মোহিতলাল, জীবনানন্দ, অজিত দত্ত প্রমুখ কবিরা তাঁদের রচনায় রূপকথার অনুষঙ্গ শব্দ চিত্ররূপ সৃষ্টি করে এই ধারাটিকে পুষ্ট করে তুলেছেন। রবীন্দ্র কথিত রূপকথার প্রয়োগ বিধি জীবনানন্দের কাছে পৌঁছে ইতিহাস চেতনায় যুক্ত হয়ে নতুন স্বাদ ও মাত্রা যোগ করেছে। নমুনা -

'' আর তারা আসে নাকো ; সুন্দরীর বনে বাঘ ভিজে জুল জুল
চোখ তুলে চেয়ে থাকে - কত পাটরানীদের পাটু এলো চুল
এই গৌড় বাংলার -- পড়ে আছে তাহার পায়ের তলে ঘাসে''

(১৮ সংখ্যক কবিতা। রূপসীবাংলা।জীবনানন্দ দাশ)

আর রোমান্টিক সুর সংযোজনায় রূপকী - রূপকথার পরিমণ্ডল রচনার প্রকরণে অজিত দত্ত কিছুটা রবীন্দ্রনাথের নিকটবর্তী। তবে তাঁর কবিতার রূপকথার ব্যবহৃত রূপক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক মন ও সময়ের কাছাকাছি। বাস্তবের সত্ত ইংরেজ রাজত্ব যেভাবে ভারতের স্বাধীনতাকে হরণ করে তাকে প্রাণহীন করে ছিল তার বর্ণনায় কবি অজিত দত্ত রূপক রূপকথার আশ্রয় নিয়েছেন এভাবে -

'' এখনো হয়তো আছে মাঠে চাষী, ডিঙিতে জেলেরা
তারা দেখে অশ্বে মোড়া পরিখায় ঘেরা

বাতাসে ভাসিয়া আসে পথিকের দূর অনুরাগ,
যুকুরের প্রতিবিম্ব মিলে যায় চোখের কাজলে। ''

(মানতী । অজিত দত্ত)

মোহিতলালে পাই -

'' মনে হ'ল দিকে দিকে শিয়ারি পীরিতি
উঠিনিছে লাবন্যের মত ! সে মিলন
অহরহ - কোথা নাই বিরহ - কল্পনা!
নাহি মৃত্যু, নাহি জরা, - মহাকাল যেন
সহসা মিলন! ''

(পূরবী । মোহিতলাল)

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় সমকালে সবচেয়ে বেশি দেহকে আশ্রয় করেছেন। শুধু নর ও নারী উদ্ভিদ জগত ও তাঁর হাতে পৌঁছে মানবীয় শরীরী স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু অজিত দত্তের কবিতায় নারীরা এ জাতীয় অভেদাত্মক কল্পনা শূন্য। প্রসঙ্গত বলা যায় জীবনে নারীর উপস্থিতি বিষয়ে অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর জিজ্ঞাসা পুরুষ জীবনে সমার্থক। দুজনের, দুটি নমুনা তুলে দিচ্ছি --

'' নারী - তুচ্ছ নারী ল'য়ে যাবে দিন ? কটাদের কণা,
কড়ু কিন্তু হাস্য - মধু আ'রি অরে উচ্ছবৃত্তি করি
জীবন যাপিতে হবে? ''

(এমনি বাঁচিয়া র'বো। অজিত দত্ত)

বুদ্ধদেব বসুর - '' আর নারী? আমরা ভালোবাসিতে পারি, হেন নারী
আছে কি মরতে? অমিতের লাবন্য কি স্পর্শ করে
ধরণীর ধূলি কড়ু ? * * *
* * * *
কাহারে করিবো ধন্য মোরা
প্রেম দিয়ে ? নির্বোধ নারীর গাল, সুন্দর মাংসস্তূপ,
শরীর সর্বস্ব, মূঢ় । ''

(কোন বন্ধুকে। বুদ্ধদেব বসু)

বাংলা সনেট শিল্পী হিসেবে অজিত দত্ত একজন অন্যতম প্রধান কবি পুরুষ। এ বিষয়ের উল্লেখ করেই আমরা বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করব। আধুনিক বাংলা সনেট অজিত দত্তের হাতে এ সে পুনরায় নতুন ঐশ্বর্য ও লাবন্য পেয়েছে। রীতি পদ্ধতি সূত্রে নিষ্ঠাবান সনেট রচয়িতা কবি মোহিতলাল মজুমদার এক্ষেত্রে তাঁর সহযাত্রী এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর সতীর্থ। তবে অজিত দত্ত বা মোহিতলাল যেখানে স্বভাবত শেত্রাকান - গঠন ও রূপ মিল নির্মানে বিশুদ্ধ ভাবে ক্ল্যাসিক্যান দেবেন্দ্রনাথ সেখানে প্রধানত শিথিলরীতির* উপাসক' নমুনা -

'' নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে -
আধু গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে।
লাজিমাতে মুখখানি; চল কেতরানো;
দোহারি হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে ! ''

(প্রিয়তমার প্রতি। দেবেন্দ্রনাথ সেন)

এবং '' গুরুজনদের মাঝে। কথা কহিবার ছিলায়
কহিলায়, ' এক গ্লাস জল দেবে ? পেয়েছে পিপাসা।
যারে কহিলায় সেই বুঝিল কেবল মোর ভাষা,
তবু তার গাল দু'টি লাল হ'য়ে উঠিল লজ্জায়। ''

(গুরুজনদের মাঝে। । অজিত দত্ত)

বাক্‌রীতির বিশিষ্টতায় অজিত দত্তের সনেটগুলি এককথায় অনবদ্য। সনেটের প্রকৃত গঠন-বিন্যাসে অষ্টক্ - ষট্‌ক নির্দিষ্ট এবং মিল রচনায় বিশুদ্ধ ভাবে শেত্রাকান। উদ্ধৃত সনেট অংশটিতে* তার সব কবিতার সেই স্বাভাবিক সংযত ভাব বিন্যাস আছে। তিনি এক্ষেত্রে তাঁর সনেটগুলিতে তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দব্যবহার করে অনায়াসে তাতে সঙ্গীত সম্ভাবনা যুক্ত করেছেন।

আধুনিক বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ শেষপর্যন্ত জগতের সব মানুষের প্রতি ভালবাসার যে অঙ্গীয় আকুতি দেখিয়েছেন সেইখানে অজিত দত্ত তাঁর সতীর্থ। আশাবাদী এবং যুগসৃষ্টি হতাশা - যন্ত্রনায় কাতর ও তার ভ্রূকে উত্তরণে আকাঙ্খী উভয় কবিহৃদয় কখনোই নিরাশার ঢোরা স্রোতে আটকে যায় নি। শেষপর্যন্ত আমরা অজিত দত্তে খুঁজে পাই —

'' জীবনের ছোট ছোট অলস নিমেষগুলি ঘিরে
যতখেলা প্রাণাদন, আর একভুলের তিমিরে
বারে বারে কেবলি হারায়,
তারপর শূন্য দিনে, বিষন্ন রাত্রিতে
হারানো এ-ক্ষণগুলি চাই ফিরে নিতে
খুঁজে ফিরি আকাশে তারায়। '' (হারানো নিমেষ। অজিত দত্ত)

উল্লেখপঞ্জী

১. কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা। অজিত দত্ত। পৃষ্ঠা - ১১০

২. পরিশিষ্ট ১। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ। অরুণ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ২২৭

৩. রবীন্দ্র কাব্যের স্বরূপ। রবিরশ্মি, ১ম খণ্ড। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা - ৩৪

* কবি বলেছেন - '' প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মানব হৃদয়ের একটি নিত্য মিশ্রণ আছে। তার মধ্যে প্রকৃতির জিনিস যতটা আছে তার চেয়ে মানবের চিত্ত বেশি। এই জন্যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানব আপনাকেই অনুভব করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতই সচেতন হব প্রকৃতির মধ্যে আমরাই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে। ''

- মানব প্রকাশ। সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ

৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্য। মোহিতলাল মজুমদার। পৃষ্ঠা - ১৩৫

* এই কথারই সমর্থন আছে কবির নিজের কথায় - '' প্রাচীন [illegible] ও বটবৃক্ষগুলি পল্লীর সম্পদ, তাহাদিগকে আমি গ্রামের সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বুনিয়াদী জীবন্ত অধিবাসী বলিয়া মনে করি। বর্ষায় অজয়ের বন্যা, অন্যসময়ে তাহার লহরীমালার নৃত্য, এমন কি তাহার ধূসর বালুচর দেখিয়া আমি ক্লান্ত হইনা, দিনের পর দিন দেখি। '' - পরিবারের চিঠি। শ্রাবন, ১৩৪৭ সংখ্যা

৫. ভূমিকা। রূপসী বাংলা। জসীমউদ্দীন দাশ

৬. কাব্যের মুক্তি। স্বগতা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পৃষ্ঠা - ১৫

৭. জলের মত ঘুরে - ঘুরে একা কথা। শিবচন্দ্র লাহিড়ী। আধুনিক বাংলা কবিতা বিচার ও বিশ্লেষণ। সম্পাদক, জীবেন্দ্র সিংহ রায়। পৃষ্ঠা - ১৩৫

৮. কবিতার ভাষা : জীবনানন্দ। শ্রী শিশির কুমার দাশ। জীবনানন্দ স্মৃতি। দেবকুমার বসু সম্পাদিত।

৯. আমার কালের কয়েকজন কবি। জগদীশ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা - ১৮

* ' কবি জীবনানন্দ ' প্রবন্ধে ও ' আধুনিক বাংলা কবিতা এবং নানা প্রসঙ্গ ' গ্রন্থে অরুণ ভট্টাচার্য আশ্চর্য ভঙ্গিতে এই কথাগুলি বলেছেন। যা আমাদের বিবেচনায় যথার্থ।

১০. ভূমিকা। শনিবারের চিঠি। তার কবিতা। বুদ্ধদেব বসু। পৃষ্ঠা - ৪

১১. কবি জীবনানন্দ দাশ। সত্যেন ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা - ১৩

১২. কবিতার কথা। জীবনানন্দ দাশ। পৃষ্ঠা - ৪৭

* স্মরণ রাখতে হবে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের ও সমর সেনের কবিতাগুলি।

* 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ এই কথাগুলি লিখেছেন। প্রসঙ্গত ঐ ভূমিকাতে আমরা আরো জেনেছি যে' এ-সব কবিতা' ধূসর পাণ্ডুলিপি' - পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।

১৩. আমার কালের কয়েকজন কবি। জগদীশ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা - ২৩

* বনলতা সেন, সুনিধা সান্যাল, মৃণালিনী ঘোষাল প্রমুখ নারীরা নামপদবী সহ এসে ভিড় করেছে তাঁর কবিতায়।

* অবশ্য বুদ্ধদেব বসুও এক্ষেত্রে জীবনানন্দের মতই নারীদেহকে কাব্যে পুনরায় দিয়েছেন। তবে বুদ্ধদেব বসু তেমে তা দেহের স্থূল পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি।

* ত্রিপুরীতি বলতে শেকসপীয়র পূর্বর্তিত গঠন - বিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে শ্লোক সাথিত রূপকল্প নির্মাণ, এই উভয় প্রকারের মুন্সিয়ানা বুঝিয়েছি। অর্থাৎ শেকসপীরীয় রীতির স্তবক গঠনে ৪ ৪ ৪ ২ ও প্রায় শ্লোকান্ত মিলবিন্যাসে ক খ খ ক। ক গ গ ক ইত্যাদির সন্ধি বদ্ধ পুনরাস।

* এখানে অষ্টকের মিলের ক্রমে ক খ খ ক, ক খ খ ক। এবং ষটকে তত্ত্ব, তত্ত্ব রীতি অনুসৃত।

:: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অজিত দত্তের স্থান ::

অজিত দত্তের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৭ টি। ছড়ার বই ১ টি। শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ এবং রঙ্গরচনা গ্রন্থ ২ টি। অসম প্রবন্ধ ও একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' এই তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা। এছাড়াও তিনি অজস্র কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে বলা যায় তিরিশের দশকের কবি।

প্রথম যৌবনে, ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস' তাঁকে এযাবৎ কিছুটা হলেও স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে। এবং জীবনানন্দের বনলতা সেন বা বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতীর মত তাঁরও কবিতার নায়িকার নাম যে মালতী তা আমরা জানি। 'কুসুমের মাস' প্রধানত প্রেমের কবিতার বই। এবং সেই প্রেমের নায়িকা মালতী। অজিত দত্ত যে রোমান্টিক সুর ও আবহ আজ তাঁর প্রথম গ্রন্থে সৃষ্টি করেছিলেন - পরবর্তী প্রায় সব কটি গ্রন্থে তাকেই লালন করেছেন।

এদেশে তিরিশের দশকে একদল তরুণ কবি মোহিতলাল - যতীন্দ্রনাথ নজরুলের প্রভাব স্বীকার করে রবীন্দ্র কাব্যাদর্শের প্রচলিত পথ ত্যাগ করে নতুন পথে কবিতা লিখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বস্তুত এঁরা কেউই রবীন্দ্র বিরোধী ছিলেন না। জীবনানন্দ দাশ - সুধীন্দ্রনাথ দত্ত - বুদ্ধদেব বসু - প্রেমেন্দ্র মিত্র অমিয়চক্রবর্তী - বিষ্ণু দে এবং এঁদেরই সতীর্থ অজিত দত্ত বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দেবার সংকল্পে স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে নিজেদের বিশ্বাস ও মূল্য বোধগুলি ঠিক ঠিক তাঁরা মিলিয়ে নিতে পারেন নি। তাছাড়া সে যুগের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা গুলোও তখন আমূল পাল্টে গিয়েছে। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় মানুষ তখন আর পুরোণ, শাশ্বত মূল্যবোধ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে আস্থা রাখতে পারছিল না। তাই নতুন যুগের-সময়ের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ, ন্যায় নীতি ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় কেন্দ্র বিন্দুতে তাঁরা সজাগ পদচারণা রচনা করতে চেয়েছেন। শিল্পী বা কবি সাহিত্যিকরাও এগুলিকে প্রবলভাবে তাঁদের রচনা কর্মে আকর্ষণ করে সমকালের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের নানাভাবে ও উপায়ে যুক্ত করেছেন। প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছেন।

নানা দল ও গোষ্ঠী তে তখন সাহিত্য কেন্দ্র বিভক্ত। একদিকে 'প্রগতি লেখক সংঘ' অন্য দিকে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'। উভয় দল বা গোষ্ঠিই সমকালীন জীবনের দলিল রচনা করতে তখন সচেষ্ট। সে যাই হোক আমাদের আলোচ্য কবি অজিত দত্ত কবিতা রচনার শুরুতে এই আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি ও সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকলেও মানসিক গঠনের জন্য তিনি অচিরে ভিন্ন মেরুতে

চলে আসেন। এবং সেক্ষেত্রে তিনি কোন গোষ্ঠিরই অন্তর্গত ছিলেন না। তাঁর কাব্য সাধনার পথ হলো সব অর্থে একক।

'কুসুমের মাসের' কবির প্রেম স্বপ্নকল্পনা, অস্থিরতার ইতিহাস এবং রোমান্টিকতা পূর্ণতা পেয়েছে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পাতালকন্যা'তে। প্রত্যেক কবির তার নিজস্ব ভাবজগত ও কল্পনা পদ্ধতি থাকে। হৃদয় ও মননের যুগ্ম রসায়নে তাই তাকে অন্যের থেকে আলাদা করে আমাদের চিনিয়ে দেয়। অজিত দত্তর কবিতার একটি অন্যতম রীতি বা পদ্ধতি দূরভিসারের প্রতি আকর্ষণ এবং রূপকথাধর্মী রোমান্টিকতা। 'পাতালকন্যা'র 'পদ্মাবতী' কবিতাটি স্মরনীয়। আমরা তাঁর কাব্য আলোচনা সূত্রে সেকথা বলেছি। বাস্তবের কোন কোন পরিস্থিতিকে - সত্যকে তিনি রূপকথার দেশে পাঠিয়ে যেন পরখ করে দেখতে চেয়েছেন। 'কুসুমের মাস' এর সেই আন্তরিক প্রণয় ও সেই আর্তি 'পাতালকন্যা' কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'পূর্ণিমা' গ্রন্থে ইঙ্গিত ভিন্ন ও আরো পরিণত কণ্ঠস্বর। প্রেমের সেই মায়াবী স্বপ্নজাল রচনাতেই আর এখন চলছে না। হারানো সেই মহিমময় মাধুর্য্যটুকু তিনি দার্শনিক সত্তায় বিন্যস্ত করেছেন। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে বাচন ভঙ্গি সেই পরিচিত স্নিগ্ধতায় তাঁকেই নতুন করে চিনিয়ে দেয়। জীবন যে শুধু স্বপ্ন নয়, সেখানে যে বাস্তবের রূঢ় ভিত্তি আছে একথার প্রমাণ এই গ্রন্থের কবিতায় রয়েছে। 'ছায়ার আশনা' কে আমরা বলেছি এককথায় ঘরে ফেরার কাব্য। কবি যৌবনের সেই মায়াবী জীবনে ফিরতে চান। কবির দিন-শেষের বিষন্ন চেতনা এর শরীরের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। এতে তাঁর ব্যক্তিগত বিস্তীর্ণ জীবনের অসংখ্য স্মৃতিরা ভিড় করে এসেছে। সেই স্বপ্নময় মায়াবী হাতছানি তাঁকে পুনরায় তাড়া করে ফিরেছে। 'জানালা' কাব্যগ্রন্থ আমাদের বিবেচনায় জীবনের পূর্ব সন্ধ্যালগ্নে উপস্থিত প্রৌঢ় কবির দিনলিপি। এখানে পৃথিবীর রহস্যময়তায় তিনি উৎকর্ণ। এবং হৃত যৌবন কবির অসীম বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা সবকিছুকে নতুন করে আস্বাদন করার। প্রত্যেকের আগ্রহে তিনি কবিতাগুলি রচনা করেছেন। আর আগের সেই রূপকথার মোহময়তা নয় - এতে আছে মোহভঙ্গের করুণ আর্তনাদ। অনুবাদ কবিতা নিয়ে প্রকাশিত অজিত দত্তর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'শাদামেঘ কালোপাহাড়' - এ দীর্ঘপথ পরিক্রমা সেরে কবি এখন আত্মস্থ। জীবনের সব আয়োজন সব অর্থে মেনে নেবার এক স্থিতধী প্রত্যয় ও প্রচেষ্টা এতে আছে। এককথায় এই প্রত্যয় ও জাগরণের, আবিষ্কারের, আত্মজিজ্ঞাসার। এবং এই গ্রন্থের কবিতাগুলি তাঁকে আধুনিক কবিদের অগ্রভাগে অনেকটাই নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে। কাব্যপ্রকরণ ও যুগোচিত সংস্কারবোধে তিনি অনেক বেশী অনুবর্তী কালের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছেন।

কবির তিন পর্যায়ের ও প্রকরণের কবিতা 'নষ্টচাঁদ' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। কবিতাগুলিতে দ্বিতীয় মহাসমর-এর ভাবনা ও চেতনা অস্থির পরিস্থিতি প্রকাশিত হয়েছে নানাভাবে - নানাউপায়ে। তার বিস্তারিত আলোচনা কাব্য আলোচনা সূত্রে ও অন্যত্র করেছি।

অজিত দত্ত অনেক সনেট রচনা করেছেন। এবং এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব ও পুঙ্খিতার সার্থকতা কি অসীম এবং কতটা দীপ্ত ও উচ্চস্তরের সে আলোচনা আমরা করেছি। এছাড়া ছড়া ও বাংলা কবিতা রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

অজিত দত্ত গল্প উপন্যাস রচনা না করলেও রম্যরচনা এবং প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি তাঁর গদ্যের গঠন ও প্রকাশভঙ্গি অথবা প্রমাণ, বিশ্লেষণ নিখুঁত ও যথাযথ। যতাযত স্পষ্ট ও সোচ্চার হওয়ায় পাঠককে বিতর্ক - বিবাদের মুখে পড়তে হয় না। মতাদর্শে কোনভাবে একদেশদর্শিতা নেই। সুতরাং সুচিন্তিত গদ্যকর্মে তা সে প্রবন্ধই হোক অথবা সরস রম্যসাহিত্যই হোক উভয় ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট মননের স্বাক্ষর রেখেছেন।

আমরা আগেই বলেছি অজিত দত্ত প্রথমত কবি। সুতরাং তাঁর যাবতীয় রচনা কর্মেই কবি-জনোচিত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও শিল্পী সুলভ আত্মবিশ্বাস সক্রিয় ছিল। তিনি কোন ক্ষেত্রেই নিজের বিশ্বাস ও চেতনার বাইরে অন্যকোন মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি কর্মে প্রেরণা হন নি। জীবনের সুস্থিতি রক্ষার, শিল্প তথা সাহিত্যের সুস্থিতি রক্ষার নীরব প্রয়াস অনায়াসে তাঁর লেখায় আমরা খুঁজে পাব। এক কথায় বিশুদ্ধ কাব্য রচনার পুঁথা তিনি যে লালন করেছেন তা তাঁর কবিতা পড়লে ধরা যাবে।

তিরিশের দশকে আবির্ভূত অন্যান্য কবিদের কাব্যে যেমন আধুনিক কবিতার প্রক্রিয়া প্রকরণের জোয়ার লক্ষ্য করা যায়, তাঁর কাব্যে ঠিক সেভাবে ও পরিমাণে আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ গুলো অনায়াস লক্ষনীয় নয়। অবশ্য তাঁর কাব্যে তাই বলে আধুনিক সময়ের সমস্যা গুলো নেই তা নয়। আছে - অনেকভাবেই আছে, তবে প্রকাশ ভঙ্গি ও অন্য অন্যান্য কারণে তাঁর কবিতাকে এককথায় আধুনিক শিরোপা দেওয়া সমীচীন নয়। এর আলোচনা আমরা আগেই পৃথক ভাবে উপস্থাপিত করেছি।

রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে, তাঁর বিশ্বাসের জগতের প্রায় বিপরীত মেরুতে উপনীত হয়ে কবিতা রচনার যে প্রয়াস তিরিশের কবিদের আকৃষ্ট ও উত্তান করেছিল, কবি অজিত দত্ত তার সঙ্গে প্রথম যৌবনে নিজেকে সক্রিয় ভাবে যুক্ত রেখেও পরবর্তীকালে সেখান থেকে সরে এসে নিজের হৃদয়ের মননের চাহিদা অনুসরণে কবিতা রচনা করেছেন। সমকালের তাৎক্ষণিক চাহিদার কোন প্রতিফলন এখানে নেই অথবা উৎকট জীবনদর্শনের বিন্যাস ও রচনা করে তিনি পাঠককে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করতে চান নি। এককথায় কবিতা রচনার বিশুদ্ধতম প্রয়াসী হিসেবে তাঁকে দেখাই যুক্তি সঙ্গত। তাঁর কবিতা আমাদের তাই কোনভাবেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দাঁড় করায় না। অথবা আমাদের প্রাণের স্বচ্ছন্দ আরামে ব্যাঘাত ঘটায় না। সমকালে অন্যান্য প্রায় সকল কবিরা যখন বিভিন্ন বিদেশী কবিদের দর্শনের অনুসরণে নিজেদের সমুখ ও আধুনিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে ব্যস্ত কবি অজিত দত্ত তখন আমাদের দেশের প্রাচীন রূপকথার জগতে মতবিরত আধুনিক জীবনের থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে চলেছেন। তিনিই লিখতে পেরেছেন —

' কুমার শুনেছে রূপকথা;
সাপের নিশ্বাসে যিয় পাতালের অবশ প্রাসাদে ক
কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে,
- নীল স্লানতা।
সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফিরাবে কোন জন?

এমন অদ্ভুত রূপ আছে কোন্ রাজকুমারীর?
এমন চোখের পাতা (কুমার দেখেছে স্বপ্ন তা'র)
পৃথিবীতে কার আছে? কার আছে এমন শরীর?
এমন পুরান ঠোঁট আছে কোন্ সম্রাট - কন্যার?
আর কোন্ কন্যা আছে যার খোঁজ কেহ নাহি জানে,
কুমার একেলা যাবে - পণ তা'র - যাহার সন্ধান;
তারি কাছে গেছে কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফিরাবে কোন জন? ''

(পাতালকন্যা)

এই অতীত কাহিনী নির্ভরতার ধরণ আমরা তাঁরই সমকালের জীবনানন্দের রচনাতেও প্রত্যক্ষ করি। বিষ্ণু দে বা বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়ও বিরল নয়। তবে অজিত দত্তের কবিতায় এসবের ব্যবহার প্রচুর।

আসলে অজিত দত্ত গীতিপ্রাণ কবি। তাঁর প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই অনেক আশ্চর্য সুন্দর লিরিক কবিতা আছে। সেগুলিতে আবেগের অকারণ বাড়াবাড়ি নেই। শান্ত কোমল পদাবলীর, যতই তার স্বাদ মধুর। আমাদের আপ্লুত করে – ভাবায়। যেমন যেখানে তিনি লেখেন –

'' আমি সেই বায়ুস্রোতে খসে – পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীল মোর কাব্য লিখি অবিরত,
সে – আকাশ তোমার অন্তর,
মানসী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।। ''

(একটি কবিতার টুকরো)

তখন বোঝা যায় কী অসীম ঐশ্বর্য এই লিরিকের শরীরে। কবির উচ্ছ্বাস কত সংযত আবেগে ব্যক্ত অথচ সেই কত আশ্চর্য ভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা বা ভাবানুষঙ্গ, রীতি প্রকরণ, বাস্তবতা রোমান্টিকতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই তিরিশের দশকে আবির্ভূত কবিদের সঙ্গে পূর্ববর্তী কবিদের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অজিত দত্তের কবিতায়ও সেই পার্থক্য চিহ্ন সুস্পষ্ট। বস্তুত আধুনিক কবিদের মতই অনুভূতি ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে আধুনিকতার স্বাক্ষর বহন করেও অজিত দত্তের কবিতা রোমান্টিক কল্পনা প্রবণতা ও অন্যবিধ বৈশিষ্ট্যে আশ্চর্য। এ তাঁর মানস গঠনের ফল। একইসঙ্গে বর্তমান জীবন জটিলতার, আবর্তের ভিতর রোমান্টিক অতীতের স্মৃতিকে এঁরা ধরেছেন। অজিত দত্তের কবিতা এই প্রকারের রোমান্টিক। বর্তমানের বিক্ষুব্ধ জীবন প্রবাহে অস্থির কবি কখনো কখনো বা অতীত মুখীন হয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। যে সমস্যা তাঁকে বিচলিত ও অস্থির করেছে তাকে অস্বীকার করে নয়, তার উর্দ্ধগত হয়ে তাকেই রোমান্টিক কল্পনা সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন। বাস্তব ও রোমান্টিক ধারার সমগ্র লক্ষণগুলি যুগ্মভাবে স্বীকৃত ও আত্মীকৃত হয়েছে তাঁর কাব্যে। জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক উপভোগের ভিতর দিয়ে তাঁর রোমান্টিক সত্তা বিকাশ লাভ করেছে বলা যেতে পারে।

সুতরাং পাশ্চাত্য রীতির আদলে বাংলা কবিতায় যে পালাবদল আমরা তিরিশের দশকের কবিদের কাব্যে নানাভাবে প্রত্যক্ষ করি, কবি অজিত দত্ত সেকালে সেই নতুন রীতির কাব্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেও স্বভাবত

স্বতন্ত্র থেকেছেন। তিনি উদ্দাম চলতি স্রোতের বাইরেই নিজেকে প্রয়াসভর রেখেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিরিশের বিশিষ্ট কবিদের একজন বলে তাকে বিবেচনা করা সমীচীন। সনেট রচনায়, ছড়া ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তিনি যে দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতেই বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট। এ ছাড়া যথার্থ ও উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব শক্তির পরিচয় তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থেও আমরা পাই। তাঁর গদ্য প্রবন্ধ ও রম্যরচনাগুলিও সূক্ষ্ম মননের স্বাক্ষর বহন করে। প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে কবি - প্রাবন্ধিক অজিত দত্ত স্বাতন্ত্র্যভাষী রোমান্টিক শিল্প স্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হয় না।

: উপসংহার :

অজিত দত্তের প্রধান পরিচয় তিনি কবি। তিরিশের দশকে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যুগ্মভাবে ''প্রগতি' পত্রিকা সম্পাদনা সূত্রে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। এবং ঢাকায় বসে দুজনে আধুনিক কবিতা আন্দোলন সুরু করেছিলেন হাতে লেখা এই 'প্রগতি' পত্রিকার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত মুদ্রিত আকারে 'প্রগতি' পত্রিকা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু নিজেই জানিয়েছেন –

> "... বন্ধুরা মিলে স্থির করা গেল হস্তলিপি - পত্রিকা আর নয়, এবারে একটি মুদ্রাযন্ত্র নিঃসৃত দস্তুর মাফিক মাসিকপত্র চাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত নেবার মাস দুয়েকের মধ্যে আষাঢ় মাসের কোন এক দিনে আমার এবং টুলুর যৌথ সম্পাদনায় - এবং প্রধানত এই দু-জনেরই আর্থিক দায়িত্বে - 'প্রগতি'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করলো।"[১]

আধুনিক কবিতা আন্দোলনে ও এর প্রচার প্রতিষ্ঠায় 'কবিতা' পত্রিকার নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। এই ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকাটিরও প্রথম সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠায় অন্যান্যদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে ছিলেন অজিত দত্ত। এবং এই কবিতা পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সেই সময়ে গড়ে ওঠে একটি কবি ও লেখক গোষ্ঠি। যাইহোক কবিতার আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এক জায়গায় বুদ্ধদেব বসু লিখছেন –

> "... বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত, দেবীপ্রসাদ ও সমাধীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নানা ভাবে 'কবিতা'কে সাহায্য করে আসছেন।"[২]

বস্তুত ১৯২১ সালে ঢাকার কিশোরীলাল জুবলী কলেজিয়েট স্কুলে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় হয়, তাই পরবর্তী সময়ে গভীর বন্ধুত্বের রূপ পায়। অন্যদিকে স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি নিয়মিত ভাবে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। এবং সেই সূত্রেই

পরিচিত হন মনীশ ঘটকের সঙ্গে। এবং তাঁরই অনুরোধে 'কল্লোল' পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। ঢাকাতেই আই.এ. পড়ার সময় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধু ও সহপাঠী হিসেবে পান অমলেন্দু বসু, পরিমল রায় প্রমুখ কৃতী ব্যক্তিদের নিবিড় সান্নিধ্য।

এম.এ. ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় ১৯৩০ সালে ডি.এম লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস'। কবির বয়স তখন ২৩ বছর। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বতন্ত্রভাষী রোমান্টিক কবি হিসেবে পরিচিত হন। বাংলা কাব্যে রোমান্টিকতার নতুন সুর সংযোজিত হয় তাঁর এই সময়ে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যৌবনেই কবি সক্রিয়ভাবে আধুনিক কাব্য আন্দোলন ও নিজস্ব গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে একটি স্থায়ী আবেদন রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। ঈর্ষণীয় বন্ধুভাগ্যও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিযুক্ত হন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও কিছুটা নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন।

'কুসুমের মাস' প্রকাশের পর পরই অজিত দত্ত কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন। জমিদার বংশের সন্তান এসে ওঠেন উত্তর কলকাতার এক সাধারণ ভাড়াবাড়ীতে। তারপর নানা মেসবাড়ী ও বাসা বদল করতে করতে অবশেষে ১৯৩৮ সালে 'কবিতাভবনে'র তিন তলায় তিনি স্থায়ী হন। ঐ বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই 'পাতালকন্যা'। ততদিনে কার্যত 'কবিতা' পত্রিকার সংগে তাঁর সম্পাদকীয় যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কেননা প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাহিত্য তত্ত্বগত ও অন্যবিধ নানা কারণে মতান্তর হয়। অন্যদিকে প্রচার প্রতিষ্ঠাগত বানিজ্যিক বিষয়গুলোতেও অজিত দত্ত নিজেকে ঠিক ঠিক উন্মুক্ত তো করেনই নি। বরং এসবের ঘোর বিরোধীই ছিলেন বলা যায়। আত্মপ্রচারসর্বস্ব যুগে বসবাস করেও এভাবে নিজেকে সবদিক থেকে গুটিয়ে রাখার ফলে সেই সময়ের একজন অন্যতম প্রধান কবি হয়েও প্রায় অপ্রচারিত রয়ে গিয়েছেন। তবে ছেলেবেলার বন্ধু বুদ্ধদেবের সঙ্গে নানা মতান্তর ক্রমে তাঁকে যে কিছুটা

অভিমানী করে তুলেছিল তা বলায় কোন অসুবিধে নেই। কেননা ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ-এর একই বাড়ীতে দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করেও দুজনের মধ্যে তেমন কোন নিয়মিত ও হার্দিক যোগাযোগ আর ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর ঘরে নিয়মিত তুমুল বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আড্ডায় অজিত দত্তের উপস্থিতি বিরল ছিল। হয়ত জীবনের মধ্যসীমায় পৌঁছে দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে থাকবেন।

কলকাতায় বসবাসকালে চাকরী জীবনের প্রথম পর্বে রিপন স্কুলে শিক্ষকতা বা একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে *Publicity Officer* হয়ে চাকরী সূত্রে সময়াভাব হলেও ১৯৪৫ সালে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নষ্টচাঁদ' প্রকাশিত হয়। নাগরিক জীবনের কোলাহল যে তার রোমান্টিক কবি হৃদয়কে যন্ত্রনাবিদ্ধ করে তুলেছিল তা স্পষ্টরূপে এখানে বর্ণিত - প্রকাশিত। ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সালে চাকুরীহীন অবস্থায় প্রকাশ করেছেন 'দিগন্ত' পত্রিকা। একই সঙ্গে 'দিগন্ত পাবলিশার্স' প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন। পত্রিকা ও প্রকাশনা সূত্রে এই সময়ে তিনি কিছুদিনের জন্য আবার ব্যক্তিগত প্রবণতার প্রায় বিরুদ্ধে সাহিত্যিকমহলে যুক্ত হয়ে যান। যদিও সে সময়কাল মাত্র চার বছর। তবে এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনোযোগ দাবী করে। তা হলো, এই প্রকাশনা থেকেই সেকালের প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় লেখকদের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, লীলা মজুমদার, শৈলজানন্দ, মণীন্দ্রলাল বসু প্রমুখ লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করলেও প্রকাশনা তাঁর কাছে নিছক ব্যবসায়িক বিচার বুদ্ধি নয়, এও তাঁর সাহিত্যকর্মের মত নীরব সাধনা ছিল। কবির মানসিক গঠন বোঝার পক্ষে এই বিষয়টি জরুরী। যাইহোক সেই সময়ে তাঁর নিজেরও কয়েকটি গ্রন্থ তিনি এখান থেকেই প্রকাশ করেন। 'নষ্টচাঁদ' ছাড়াও 'ছায়ার আল্পনা' 'ছড়ার বই' রম্যরচনাগ্রন্থ 'মন পবনের নাও' ইত্যাদি।

অবশেষে তিনি চন্দননগর গর্ভনমেণ্ট কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজে হয়ে ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। এই পর্বে আমরা কবির সঙ্গে গদ্য লেখক-সমালোচক-সাহিত্যতত্ত্বের আলোচক অজিত দত্তকে আবিষ্কার করি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি লেখেন 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' ১৯৬০ সালে। তিনি এতকাল বিশুদ্ধ

কা ব্যচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন – এখন থেকে তার সঙ্গে যুক্ত হলো গবেষক-প্রাবন্ধিক-সমালোচক সত্তা। প্রসঙ্গত বলা যায় আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রবিরোধী (বুদ্ধদেব বসুর বন্ধু হিসেবে তিনিও) এমন একটি ধারনা প্রচলিত থাকলেও এই ধারনা যে অসার তা রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ বা আলোচনায় তিনি প্রমাণ করেছেন। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা আমরা যথাস্থানে করেছি।

অজিত দত্ত বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা সাহিত্যের অগ্রজদের বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল। আর এই সময়কালেই তিনি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, রাজশেখর বসু, সুকুমার রায় প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের রচনার বিশ্লেষণ - মূল্যায়ণ করতে শুরু করেন। পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক ও সাহিত্যতত্ত্ব-মতবাদ বিষয়ক অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রসঙ্গত আমরা বলতে পারি 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থটি ছাড়া বাকি এই বিপুল রচনার কোনটিই অধ্যাপনা সূত্রে বা ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে লেখা নয়। এই সব রচনায় তাঁর পান্ডিত্য-মনন ইত্যাদির সঙ্গে কবিহৃদয় যুক্ত হয়েছে বলা যায়।

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি রম্যরচনা গ্রন্থ। যথাক্রমে 'পুনর্ণবা' (১৯৫০) ও 'জানালা'(১৯৫১) এবং 'জনান্তিকে'(১৯৪১)। সব কটি গ্রন্থেই তাঁর নিজস্বতা মুদ্রিত। এবং বোঝা যায় যে তিনি সন্তর্পণে একাই কাব্যরচনা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠাভূমি সমকালীন অন্যদের সঙ্গে একই পংক্তিতে নেই।

সংসার জীবনে প্রায় সব অর্থে সফল অজিত দত্ত কাব্য-সাহিত্যের জগতে সেই অর্থে ছিলেন ততটাই অসফল। আর তথাকথিত সেই অসাফল্যের মূলে ছিল স্বেচ্ছা-নির্বাসন। অবশ্য এই নির্বাসনের জন্য কোন অভিযোগ-অনুযোগের খবর আমাদের হাতে নেই। তবু একটা অভিমান যে ছিল সেকথা আমরা আগেই বলেছি। তবে তার কোন সরব প্রকাশ জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মানসিক গঠনই ছিল আত্মমগ্নতার তথা একাকীত্বের অনুকূল। এবং নানা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কবিতায় 'ইনটেলেকট্' -এর নতুন ফ্যাশান'কে তিনি তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেননি। তাই একদা 'কুসুমের মাস'-এর

বিখ্যাত কবিকে ভুলে যেতে পাঠকদের বেশী সময় লাগেনি। তিনি নিজেই জানিয়েছেন -

"... কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয়েছে যে ও-জাতীয় মন নিয়ে এ-যুগে
কবি হতে গিয়ে বোধহয় আমি কালবিপর্যয়ের এক উদাহরণ হয়ে রইলাম।"[৩]

আমরা তাঁর জীবনী আলোচনা সূত্রে বলেছি যে আমাদের দেশে নাম-যশ-প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিভা যথেষ্ট নয়। এ সবের জন্য যা বেশী দরকার সেই বিপুল জনসংযোগ - গোষ্ঠিভুক্তি-আত্মপ্রচার-ধরাধরি ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা, আগ্রহ ছিল না কোনদিনই। তাছাড়া সমকালে সতীর্থদের মত অনর্গল লিখে যাওয়া বা ফরমায়েশী রচনাকর্ম এগুলোর কোনটিতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। আর এভাবেই 'কুসুমের মাস'-এর নির্জনতাপ্রিয় শান্ত স্বভাবের অজিত দত্ত আস্তে আস্তে নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নিয়েছেন কাব্যজগতের তৎকালীন ব্যস্তসময় প্রধান জায়গা থেকে। তাঁর নিজের সেই কবিতাটি এক্ষেত্রে আবার উচ্চারণ করছি –

"সমস্ত পৃথিবী নয়, সমস্ত আকাশ নয়,
নয় আদিগন্ত মাঠ, সিন্ধু-গিরি-মালা,
হীনপ্রভ চোখে শুধু একখণ্ড বিশ্বরূপ –
কাঠের সীমানা আঁটা একটি জানালা।"

আমরা দেখেছি এদেশে 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি একে সমর্থন করলেও অচিরেই অন্য অনেকের মত তাঁরও মোহভঙ্গ ঘটে যায়। আসলে তাঁর কবিতার-মননের যে গড়ন, তা 'প্রগতি লেখক সংঘের' উদ্দেশ্যের সঙ্গে কোনভাবেই মানানসই ছিল না। 'কুসুমের মাস', 'ছায়ার আল্পনা', 'পুণর্নবা' ইত্যাদি গ্রন্থের কবিতাগুলিতে সঠিকভাবে তার কবি হৃদয় উন্মুক্ত হতে পেরেছে। সে পথ নির্জন, নিঃসঙ্গ রোমান্টিক কল্পনার জগৎ। যুগের বা সময়ের সাময়িক চাহিদা পূরণে তা ব্যর্থ। সে সংকল্পও তিনি কোনদিন নেননি। এমনকি তাঁর সাহিত্য তত্ত্ব ও সমালোচনামূলক গদ্য রচনাতেও তাঁর এই বিশিষ্ট ও ট্র্যাডিশনাল মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তাই তিনি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন –

"... মানুষের ব্যষ্টিকে তাই কাব্যে সাহিত্যে সবচেয়ে বড়ো সম্মান দিতে হয়, সমষ্টির প্রশ্ন ওঠে না। কেননা ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। ব্যক্তিগত প্রেম ও স্নেহ, দুঃখ ও আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য হয়, তাহলে তা সমষ্টিকে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে। মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজ নেই - রাষ্ট্র ও অবান্তর।"[৪]

অথবা অন্য আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন —

" আজকের অধিকাংশ পাঠক কাব্য-সাহিত্য-ললিত কলার সূক্ষ্ম রসে কোনরূপ আকর্ষণ অনুভব করে না। সে চায় মতবাদ, সে খোঁজে রাজনৈতিক কর্মসূচী,— এবং এ সব জিনিস পদ্যাকারে গ্রন্থিত হলে সে তাকে কাব্য বলতে দ্বিধা করে না। সে চায় উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ তা সে গোয়েন্দা কাহিনীতেই হোক অথবা 'বিপ্লব' ও 'সংগ্রামে'ই হোক।"[৫]

সুতরাং তিনি যে যুগের প্রেক্ষিতে 'কালবিপর্যয়ের' উদাহরণ হয়ে থাকবেন তা আশ্চর্যের নয়। তাই স্মরণীয় হলেও তিনি জনপ্রিয় নন কোনভাবেই।

তিরিশের দশকে - আরো বিশেষভাবে বললে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই আমাদের দেশেও সামাজিক - অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবনে বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিদেশী চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক, সমাজতত্ত্ববিদদের নতুন নতুন মতবাদ ও বিশ্লেষণ আমাদের নিত্য পরিচিত ব্যক্তি ও সমাজকে অচেনা ও জটিল করে তুলেছিল। পাল্টে যাওয়া মূল্যবোধকে পুঁজিয়ে সাহিত্যে-শিল্পে-কাব্যে উপস্থাপিত করলেন প্রায় সব কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা। অজিত দত্ত, আগেই বলেছি, কি গদ্যরচনায় (প্রবন্ধ ও অন্যান্য মননধর্মী রচনায়) কি কাব্যে এসবকে সেইভাবে বরণ করে চলতি স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। সর্বপণে - নিঃশব্দে একে পাশ কাটিয়েছেন। অবশ্য সে কারণে তাঁকে অবাস্তব বা কল্পনাসর্বস্ব কবি বলাও যাবেনা। আসলে জীবনের সুস্থ ভোগ বাসনা-ঐতিহ্যকে লালিত করে নিজের হৃদয় ও মননকে এসবের প্রভাবহীন রেখে কবিতা বা গদ্য রচনায় নিজস্বতা এবং নিজের বিশ্বাসকে অবিচল করেছেন। তবে সাময়িক বিচলন ও অস্থির যুগযন্ত্রনার ছাপ 'নষ্টচাঁদ' কাব্যগ্রন্থকে বিশিষ্ট ও যুগোচিত মূর্তি দিলেও তিনি তাতেই স্থিত হতে পারেননি।

অন্যদিকে অজিত দত্ত অনেকটা পরিণত বয়সেই প্রবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদি গদ্য লেখায় হাত দেন। এবং লঘু প্রবন্ধের বই হিসেবে 'জনান্তিকে' পড়ে রাজশেখর বসু প্রমুখ বিদগ্ধ জনের প্রশংসা পেয়েও বা 'ঘন পবনের নাও' লিখে সাধারণের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেও তিনি নিজেকে এব্যাপারে সংবৃত করেছিলেন। ১৯৬৮ তে এই দুই গ্রন্থের সম্মিলিত রূপ 'সরস প্রবন্ধ' প্রকাশের পর আর একটিও এ জাতীয় হাস্যরসাত্মক রস রচনা লেখেননি। এ সবই তার সামাজিক জীবনের সেই অদ্ভুত নির্লিপ্ততার সঙ্গে একাত্ম ও সমান্তরাল।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯৭০ সালে চাকরী থেকে অবসর নিয়ে ঘরেই বাকি দিনগুলি কাটিয়েছেন। এই সময়ে তার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সাদা মেঘ কালো পাহাড়' প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার পরে আর কোন গ্রন্থই প্রকাশিত হয় নি। হয়ত বা সেকারণেই জীবনের উপান্তে পৌঁছে তিনি লিখেছিলেন - " লিখবো, কিন্তু কার জন্য লিখবো - তা মাঝে মাঝে ভাবি।" জীবনে কোন পুরস্কার পাননি - সে দুঃখ বা মনোকষ্ট হয়ত হৃদয়ের কোন গভীর সীমানায় থাকলেও তাতে বিচলিত হয়ে আদর্শ ও বিশ্বাসচ্যুত হননি। এই গৌরব তাঁর প্রাপ্য। তাই অশক্ত শরীরেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিতা লিখেছেন।

অজিত দত্ত সমকালের বন্ধু বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আর কারো রচনায় তাঁর কবিতার আলোচনা দেখে যেতে পারেননি। পরবর্তীকালেও যে তাঁকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে সে প্রমাণও আমাদের হাতে নেই। অথচ তিনি আলোচনাযোগ্য কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন বলেই আমরা মনে করি।

প্রথম যৌবনের ব্যক্তিগত তীব্র অনুভবের, অবস্থার যে রোমান্টিক প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি কুসুমের মাসে, সারাজীবনের প্রায় সব কবিতায় সেই তীব্র অথচ স্নিগ্ধ, আলোকিত, কাম্য, আস্বাদিত অথচ বহুদূরের সুরের মতই মৃদু সুরভিত। আমাদের আকর্ষণযোগ্য এই হলো অজিত দত্তের কবিতার চরিত্রলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। জীবন যাপনের প্যাটার্ণে আমরা এমনই এক বাহ্যজগৎ সম্পর্কে - সামাজিকভাবে প্রায় অমনোযোগী অজিত দত্তকেই দেখি। প্রতিষ্ঠা-প্রচার-নাম-যশ-পুরস্কার ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন এমন যার চরিত্র তাঁর কাছে সমকালের উত্তপ্ত বিষয় ও দর্শন আশ্রয়ী রচনা আমরা আশা করতে পারিনা। তিনিও লেখেননি। নিজেরই জীবন প্রবাহের মত স্থির অচঞ্চল-মন্থর

উল্লেখপঞ্জী

১। আমার যৌবন,। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ,। ৪র্থ খণ্ড,। পৃ.৪০০

২। সম্পাদকীয়,। বুদ্ধদেব বসু,।'কবিতা' পত্রিকা,। আষাঢ়, ১৩৪৮ সংখ্যা

৩। ভূমিকা,। অজিত দত্তের কবিতা সংগ্রহ,। পৃ-১।০

৪। কালকের কাব্য আর আজকের কবিতা,। অজিত দত্ত,। পূর্বাশা,। কার্তিক, ১৩৫৫,। পৃ.৪৮২

৫। ঐ । ঐ । ঐ । ঐ । পৃ.৪৮০

Universi Library
Raja Rammohunpur